সময়ের ছবি

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

সময় পালটেছে। পালটেছে সমাজের মুখছবি। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। পালটেছে মানুষের আত্মীয়তাবোধ। ভালোবাসা। রক্তের সম্পর্কে এখন আর সেই পুরোনো টান নেই। মানুষ এখন নিজের ছায়া দেখে চিনতে পারে না সে কে।

সময়ের ছবি, এমনই বদলে যাওয়া সমাজের গল্প। তিন বৃদ্ধ দম্পতি, সম্পর্কের অনুসন্ধানে তারা সবাই প্রবঞ্চিত। কী তারা পেতে চেয়েছিলেন, আর পেলেনই বা কী! নিষ্ঠুর পালটে যাওয়া সমাজ তাদের কিছুই পেতে দিল না।

অথচ তারা কতই না ঘাম ঝরিয়েছিলেন তাদের সন্তানের সুখের জন্য, সমৃদ্ধির জন্য! এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দোরগোড়ায় তাদের পৌঁছে দেবার জন্য। যাদের সুখের পথ গড়তে তারা তাদের সর্বস্ব বাজি ধরল, সেই পথই তাদের পৌঁছে দিল এক অন্ধকার উপলব্ধিতে।

আদিত্য এবার স্কুলে ভরতি হবে। ওকে স্কুলে ভরতি করা নিয়ে আজ বেশ কিছুদিন ধরেই ওর মা বাবা চিন্তা করছিল। আদিত্যর দাদুর ইচ্ছে ও বাড়ির কাছে একটা কে. জি. স্কুল আছে, ইংলিশ মিডিয়াম, ওখানেই ভরতি হোক। সবে ওর তিন বছর বয়েস। ওইটুকু ছেলেকে দূরে কোনো স্কুলে না দেওয়াই ভালো। আসা যাওয়া করতে করতেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তাছাড়া কে ওকে রোজ রোজ দিয়ে আসবে, নিয়ে আসবে সেটাও ভাবতে হবে। বাড়িতে লোক বলতে ওই কজন আদিত্য, আদ্যিত্যের দাদু দিদা, আর বাবা মা। বাবা মা তো ভোর হলেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দুজনেই কাজে বেরোয়। আর দাদু দিদারও বেশ বয়স হয়েছে। ওরা যে ওকে স্কুলে দিয়ে আসবে, নিয়ে আসবে তাও ভাবা যায় না। আর ওই ভ্যান গাড়িতে যাওয়া? আদিত্যর মার একদমই পছন্দ নয়। তাই ওর স্কুলটা বাড়ির কাছে হলেই ভালো। কিন্তু ওই স্কুলটা আদিত্যর মার মোটেই পছন্দ নয়। ওটা একটু সস্তা গন্ডার স্কুল বলে ওখানে সবাই ভরতি হয়। শোভনবাবুও সেদিন বলছিল। ওর ছেলেটাকেও ও নাকি ওই কে. জি. টাতেই ভরতি করেছে। শোভনবাবুর বাজারে একটা স্টেশনারি দোকান আছে। স্কুলটায় ভরতি করতে তেমন টাকার কামড় নেই বলে ওখানে অনেকেই তাদের বাচ্চাদের ভরতি করে। স্টেশনারি দোকানের মালিক, মুদির দোকানের মালিক, আলুওয়ালার ছেলে, ফলওয়ালার মেয়ে। আদিত্যর মায়ের ইচ্ছে ওর বাচ্চা প্রথম থেকেই টপ্ কোনো স্কুলে ভরতি হবে। টপ্ মানে যেখানে শুধু বড়ো বড়ো লোকের বাচ্চারা ভরতি হয়। ওই সব আলু পটল ওয়ালার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এক স্কুলে ভরতি করলে, আদিত্যর মা মানে মউ ভয় পায়, তাহলে বলা যায় না যত আবোল তাবোল কথা শিখবে। গাল-মন্দ আরো কত কী! তার চেয়ে ওঁকে তেমন কোনো টপ্ স্কুলে ভরতি করবে, যাতে ও বড়ো হয়ে নিজেও একজন টপ্ হয়। তাছাড়া মউ-এর ধারণা ছোটো খাটো ইংলিশ মিডিয়ামে ভরতি হলে আদিত্য ইংরাজিটাও তেমন ভালো করে শিখবে না। ওর উচ্চারণগুলো হবে যাচ্ছেতাই। যেভাবেই হোক মউ-এর ইচ্ছে আদিত্য প্রথম থেকেই মানুষ হোক পাক্কা সাহেবের মতন করে। যাতে ও কথায় কাজে একদম অন্যরকম হয়। আর পাঁচটা ছেলের চেয়ে একদম আলাদা।

আদিত্যর মা তো কিছুদিন বিলেতে ছিল। ওর বাবা ডাক্তার। আদিত্যর বাবা যখন লন্ডনে গেসল ডাক্তারি পড়তে, আদিত্যর মা গেসল সঙ্গে। আসলে আদিত্য জন্মেছে বিলেতে। আর সেই কথাটা মউ ঘুরতে ফিরতে সবাইকে শোনায়। আমার ছেলে জন্মেছে বিলেতে। ওকে আমি বানবোই পাক্কা সাহেব।

ছেলেকে পাক্কা সাহেব বানাতে শেষে মউ আর প্রতাপ খুঁজে পেল একটা স্কুল। সেন্ট মার্গারেট হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল। সেই সল্টলেকের দিকে। বাইপাসের ধারে। মানে ওদের বাড়ি থেকে বহু দূরে। তা হোক কিন্তু শোনা যায় স্কুলটা নাকি দারুণ। স্কুলের নাম শুনেই আদিত্যর দাদু দিদার মুখ শুকিয়ে গেল। এইটুকু ছেলে কীনা রোজ স্কুলে যাবে কুড়ি মাইল পথ পেরিয়ে। দেড় ঘণ্টা বাসে চেপে।

মউ বলল সে আপনাদের ভাবতে হবে না। ওতো আর হেঁটে হেঁটে স্কুলে যাবে না। ওর জন্যে রোজ এসি বাস আসবে। এসি বাসে নিয়ে যাবে আবার দিয়েও যাবে।

বলো কী! ওইটুকু ছেলে এসি বাসে চেপে স্কুলে যাবে। মউ বলল—হ্যাঁ, আজকাল বড়ো বড়ো সব স্কুলেরই একই নিয়ম। ওদের সবারই বাস এসি। ওরা যেমন টাকা নেয়, তেমন বাচ্চাদের জন্যে খরচাও করে। ওদের স্কুলটাও এসি।

বলো কী। অত বড়ো স্কুল তার সবটাই এসি?

হ্যাঁ। সেন্ট্রাল এসি। এসবই ওদের স্কুলের প্রসপেকটাশে লেখাই আছে। মউ আদিত্যর দাদুর হাতে একটা বই ধরিয়ে দিয়ে বলল—এইটা পড়ুন সব জানতে পারবেন। মউ আদিত্যর দাদুর হাতে সেন্ট মার্গারেট স্কুলের একটা বই ধরিয়ে দিল। আর সেটাতে চোখ বুলিয়েই আদিত্যর দাদু হাঁ হয়ে গেলেন। ভরতি হতে লাগবে নগদ পঞ্চাশ হাজার। মাসে মাসে মাইনে পনেরো হাজার। বাস আসবে রোজ সকাল সাতটায়। ছেলে ফিরবে সন্ধে সাড়ে সাতটায়।

বাব্বাঃ এত ব্যাপার! এর চেয়ে সস্তায় তো লোকে হাতি পুষতে পারে। দাদু অবাক হয়ে বললেন, তার চেয়ে তোরা ওকে দূরে কোথাও কোনো বোডিং স্কুলে ভরতি করে দে। মুসৌরি, দেরাদুন, উটি, সিমলা। তাতে খরচাও কম হবে। আর স্কুলও ভালো পাবে। এই সব মার্গরেট, ফারগারেট স্কুলগুলো তো সব সবে হয়েছে। আর ওই সব স্কুলগুলো বহুকালের বনেদি স্কুল দারুণ নাম করা। ওখানে ছেলেরা মানুষ হয় দারুণ। তাছাড়া ওগুলো সবই আন্তর্জাতিক মানের স্কুল।

মউ বলল—ওখানে অতদূরে ভরতি করতে পারলে আমি তো ওকে বিলেতেই কোনো স্কুলে ভরতি করে দিতাম।

তা তুমি পারতে। ছেলেদের মানুষ করতে তোমরা এখন চাঁদেও পাঠাতে পারে।

ভাগ্য ভালো যে সেখানে এখনও তেমন ভালো স্কুল টুল হয়নি। ছেলেমেয়েদেব মানুষ করার জন্যে তোমরা এখন সব পারো।

হঠাৎ আদিত্যর দাদু রেগে উঠলেন।

মউও ছাড়বার মেয়ে নয়। সে গুরুজনদের অত তোয়াক্কা করে না। স্বভাবে বেশ তেজি। সে অমনি দুকথা শুনিয়ে দিল আদিত্যর দাদুকে। বলল, ছেলেকে বড়ো করতে গেলে তাকে বড়ো স্কুলে দেওয়াই নিয়ম। তার জন্যে দূরে যেতে হলে যাবে।

তাবলে এত দূরে। ওই টুকু ছেলে সকাল সাতটা থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরবে রাত্রি আটটায়।

তাতে আপনাদের কী অসুবিধে আছে?' মউ খ্যাক করে উঠল।

আছে বইকি। এতক্ষণ দিদা শুনছিল ওদের কথা। এবার মুখ খুলল। তোমরা দুজন সারাদিন অফিসে থাকবে। আমরা দুটো বুড়োবুড়ি ওই কচি ছেলেটাকে নিয়ে সময় কাটাতাম সেটাও তোমাদের সহ্য হল না। এবার আমরা দুজন সারাদিন কী নিয়ে থাকব বলত?

মউ বলল—তার আমি কী জানি। আমার কাজ ছেলেকে মানুষ করা। তার জন্যে যা করার আমায় করতে হবে। ছেলে না মানুষ হলে চলবে? তখন আপনারাই আমাদের দুষবেন। বলবেন—চাকার চাকরি করে, শুধু নিজেদের ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত থেকে ছেলেটাকে গোল্লায় দিলে। সে আর মানুষ হল না।

দিদা বললেন—বড়ো স্কুলে দিলেই যদি ছেলে বড়ো হত তাহলে আর ভাবনা থাকত না। দেশের কোনো মনীষী তার ছোটোবেলায় লাখটাকা খরচা করে স্কুলে পড়েছিল বলতো? খোঁজ নিয়ে দেখো, নেতাজি সুভাষ, চিত্তরঞ্জন, ঈশ্বরচন্দ্র, মাইকেল, সবাই তাঁদের লেখাপড়া শুরু করেছিল গুরু মশাইয়ের পাঠশালায়, যে যার গ্রামের ছোটো ছোটো স্কুলে—। ওদের কারোর বাবা মা-ই ছেলে মানুষ করতে তোমার মতন অমন পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে তাদের স্কুলে ভরতি করেনি বুঝলে?

মউ বলল আমি জানি, ওই বাড়ির কাছের কে জি স্কুলটাতে ভরতি করলে ওকে, আপনারা খুশি হতেন। যত দোকানদার, আলুওয়ালা, পটল ওয়ালাদের, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ও পড়তে গেলে আপনারা খুব খুশি হতেন। কিন্তু আমি ওর মা হয়ে তা হতে দেব না। আমি বিলেতে থাকতে দেখে এসেছি স্কুল কেমন হয়। ছেলেদের লেখাপড়া কীভাবে শুরু করতে হয়।

জানি। আদিত্যর দিদা বলল, সেই সব স্কুলের সব ছেলেমেয়েই কী তাবলে মনীষী হয়েছে। তাহলে তো বিলেত আমেরিকায় মনীষী মনীষীতে ছেয়ে যেত। তাতো হয়নি। সেখানেও অমন সব স্কুলে পড়েও বহু বাচ্চা বড়ো হয়ে রদ্দি মাল হয়েছে। ও দেশে কি তুমি চোর, খুনি ডাকাত দেখে আসনি? সব দেখেছ। খুব ভালো ভাবেহ

জানো, ছেলেপিলে মানুষ করায় শুধু স্কুলই শেষ কথা নয়। বাড়িরও একটা ভূমিকা থাকে। তা না হলে আমাদের দেশের গ্রামের গঞ্জের ছেলে মেয়েগুলো মানুষ হচ্ছে কী করে। এদেশে যত বড়ো বড়ো স্কুল কলেজ সবই তো শহরে। অথচ প্রতিবারই তো মাধ্যমিক, হায়ার সেকেন্ডারিতে ফার্স্ট সেকেন্ড হচ্ছে গ্রামগঞ্জ থেকে। তারা কেউই তোমার ছেলের মতন ৫০ হাজার অ্যাডমিশন ফিজ দিয়ে সেন্ট মার্গরেটে পড়তে যায়নি। আর খোঁজ নিলেই জানতে পারবে ওই স্কুলটা থেকে কখনই কোনো ছেলেমেয়ে ফার্স্ট সেকেন্ড হয়নি। তোমরা ভাবো বড়ো টাকার আর বড়ো লোকেদের স্কুলে দিলেই ছেলে বিরাট হবে। ছেলে মেয়েদের বড়ো করতে বাবা মা, বাড়ির দাদু দিদাদেরও একটা বড়ো ভূমিকা থাকে। ও যে রোজ আমার কোলে বসে রূপকথার গল্প শুনত, দাদুর কাছে মিষ্টি মিষ্টি ছড়া কবিতা শিখছিল, সেগুলোর কী হবে? ওসব কী ওকে ওই স্কুলগুলো শেখাবে? ও একটা বিলিতি বাঁদর তৈরি হবে।

মউ তর্ক করতে গিয়ে গো হারান হেরে গেল আদিত্যর দাদু দিদার কাছে। চোখ মুছতে মুছতে নিজের শোবার ঘরে ঢুকে গেল। প্রতাপ মানে আদিত্যর বাবা বলল, এবার তোমরা সবাই থামো। মউ-এর শখ হয়েছে, ছেলেকে বড়ো স্কুলে দেবে—দিয়েছে। এখন দেখা যাক কী হয়।

পরের দিন থেকে আদিত্যর স্কুল বাস আসা শুরু হল সকাল হলেই। বিরাট এসি বাস। আদিত্য বাসে করে স্কুলে যায় আর ফেরে সন্ধেবেলা। প্রায় আটটা বাজল আদিত্যর দাদু দিদার সারাটা দিন কাটে মুখ শুকিয়ে একলা একলা। আদিত্যর দাদু আবার শুরু করল চণ্ডীবাবুদের রকে যাওয়া। ও রকের ওপর বসে যত বুড়োদের আড্ডা। তাস খেলা। হুকো খাওয়া। একদলবুড়ো ওখানে রোজই আসে সময় কাটাতে। ইদানিং আদিত্যটা একটু বড়ো হতে ওর দাদু মানে চরণবাবু ওই রকে যাওয়াটা ছেড়ে দিয়েছিলেন। আদিত্যকে নিয়ে ওর দিব্বি সময় কেটে যেত। সকাল বিকাল আদিত্যকে নিয়ে পাড়ার পার্কে যেত। আদিত্যকে গল্প শোনাতে যত পুরনো বই থেকে বাচ্চাদের উপযোগী গল্পগুলো পড়ে নিত। তারপর সেগুলো শোনাত আদিত্যকে। উপেন্দ্রকিশোরের গল্প, ত্রৈলোক্যবাবুর গল্প, ঠাকুমার ঝুলির রূপকথা, যোগীন্দ্র সরকারের ছড়া। পুরনো গল্প, ছড়া কবিতাগুলো পড়তে চরণবাবুরও খুবই ভালো লাগত। আরো ভালো লাগত সেগুলো আদিত্যকে শোনাতে। আদিত্য সেগুলো শুনতো চোখ বড়ো বড়ো করে। চরণবাবুর আসলে ওই চণ্ডীবাবুদের রকে বসে আড্ডা মারাটা মোটেই পছন্দের ছিল না। যত রাজনীতির গল্প, আর পরচর্চা পরনিন্দা এই ছিল ওখানকার সময় কাটাবার বিষয়। ইদানীং সেটা বন্ধ হয়েছিল। ওর দিব্যি সময় কাটছিল, পুরোন বই পড়ে আর আদিত্যর সঙ্গে আড্ডা মেরে। এখন এবার গেল সেটা বন্ধ হয়ে। কারণ ভোর হলেই তো আদিত্য চলে যায় স্কুলে। তারপর কত আর গল্প করা

যায় ওর বুড়ি বউ মানে সাবিত্রীদেবীর সঙ্গে। তাছাড়া সাবিত্রীদেবীর কাছে থাকা মানেই ফরমাস খাটা। সাবিত্রীদেবীর ওই এক রোগ। যখন তখন চরণবাবুকে দোকানে পাঠান। এটা কিনে আনো। ওটা কিনে আনো। তাও যদি তা ওর পছন্দ হত। চরণবাবু যেটাই আনেন, যাই করেন তারই উনি খুঁত ধরেন। সব আনাজই নাকি উনি পচা আনেন। কী মুশকিল। শুকনো লঙ্কা কিনে আনলে বলবেন এগুলো তো পোকা ধরা। হলুদ কিনে আনলে বলবে এগুলো দেখে আনলে না? হলুদগুলো তো নরম পচা। কী মুশকিল! হলুদ লঙ্কা এসবের আবার ভালোমন্দ কী? এত যে কেউ চোখ বুজে কিনে আনতে পারে। কিন্তু ওই খুঁত খুঁত স্বভাব। তাই চরণবাবুর একদমই ভালো লাগত না বাড়িতে থাকতে। বাড়িতে থাকা মানে ফাইফরমাস খাটা। তাই উনি একটু বেলা বাড়লেই চলে যেতেন চণ্ডীবাবুদের রকে আড্ডা মারতে। তাতেও অবশ্য অশান্তি হত। কারণ সাবিত্রীদেবীর ওটা মোটেই পছন্দের ছিল না। চরণবাবু চণ্ডীবাবুর রকের দিকে পা বাড়ালেই উনি শুরু করতেন খিট্ খিট্ করা। আবার আড্ডা মেরে ফিরলেই সাবিত্রীদেবী দুকথা শোনাতে ছাড়তেন না। তারপর আদিত্য জন্মাল। ব্যস। অমনি ওদের সংসারে দেখা দিল আমূল পরিবর্তন। একটা বাচ্চাকে মানুষ করা কী কম কথা। ওরা সবাই তখন লেগে পড়েছিল বাচ্চাটাকে নিয়ে। ছেলেটাকে বড়ো করা নিয়ে তখন সবারই ছিল রকম রকম আগ্রহ। সাবিত্রী শুরু করলেন কাঁথা বানান। চরণবাবুর শুরু হল পাড়ায় কোথায় কার ঘরে ভালো ছাগলের দুধ পাওয়া যায়। তা কিনে আনা। আদিত্যর মার শুরু হল চাইল্ড স্পেশালিস্টের কাছে যাওয়া। আদিত্যর শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে পরামর্শ করা। আদিত্যর বাবাও শুরু করল তাড়াহুড়ো করে রোজ হাসপাতাল থেকে ফিরে আসা। আগে রোজই প্রতাপ হাসপাতালের পর ক্লাবে যেত। বাড়ি ফিরত রাত করে। আদিত্য হবার পর সে ওই ক্লাবে যাওয়া ছেড়ে দিল। সোজা ফিরে আসত বাড়িতে। একটা বাচ্চার সুবাদে চরণবাবুর বাড়ির চেহারাটাই পালটে গেল।

যেই আদিত্যর স্কুল শুরু হল, অমনি আবার দেখা দিল চরণবাবুর সংসারে সেই পুরনো ছন্নছাড়া রূপ। একটু বেলা হলেই চরণবাবু চলে যান চণ্ডীবাবুর রকে। সাবিত্রী শুরু করে সেই নিয়ে খিট্ খিট্ ঝগড়া। প্রতাপ ওর হাসপাতাল শেষ হলেই চলে যায় ক্লাবে। আবার সেই বাড়ি ফিরতে তার রাত হয়। মউ ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওর অফিস নিয়ে। সবচেয়ে দুঃখ বাড়ল চরণবাবুর। ওনার বন্ধ হয়ে গেল রূপকথার যত বই পড়া। আদিত্যকে গল্প শোনাবার জন্যেই উনি শুরু করেছিলেন যত পুরনো বই থেকে ছোটোদের বিখ্যাত গল্পগুলো পড়া। সে সব এবার বন্ধ হয়ে গেল। কারণ আদিত্যের তো এখন আর গল্প শোনার সময়ই নেই। সে এখন তার বাবার চেয়েও ব্যস্ত। মা ওকে কোথা থেকে এক গাদা বই কিনে দিয়েছে। ও এখন সেগুলোই